**জেলহত্যা দিবস: ইতিহাসের ভয়ঙ্কর বাঁকবদল**

নাসির আহমেদ

 কালের আবর্তনে বছর ঘুরে আবার এসেছে ৩ নভেম্বর, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনকারী জাতীয় চার নেতাকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে হত্যার এক ভয়াল স্মৃতি-বিজড়িত দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করেছিল যে ঘাতকচক্র, সেই একই চক্রের হাতে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান।

 জেলহত্যা দিবস নামে পরিচিত ৩ নভেম্বর ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে আমাদের জাতিসত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম অর্জন সবচেয়ে কঠিন সংকটের অগ্নিপরীক্ষায়। সেদিনের সেই নৃশংস ঘটনা তথা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শুধু নয়, জাতীয় ইতিহাসেরও এক ভয়ঙ্কর বাঁক ফেরানো অধ্যায়। কেননা পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তেইশ বছর জীবন-যৌবন বাজি রেখে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যে রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, সেই স্বাধীন সার্বভৌম মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকেই পাল্টে দিয়েছিল ১৫ আগস্ট আর ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড।

 ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা মূলত একাত্তরের পরাজিত শক্তিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছিল। যে কারণে বঙ্গবন্ধু-হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছিল বাংলাদেশ বেতারের নাম, ফিরে এসেছিল মৃত পাকিস্তানের স্লোগান ‘জিন্দাবাদ’ আর শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পরম মিত্র ভারত-বিদ্বেষী সেই পাকিস্তানি রাজনীতির নতুন স্লোগান। রেডিও পাকিস্তান আদলে রেডিও বাংলাদেশ, জয়বাংলা হয়ে গেল জিন্দাবাদ। যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা নিয়ে বাংলার মানুষ ভাষা আন্দোলন করলো, মুক্তিযুদ্ধ করলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সেই ঐক্য ভেঙে দেওয়া হলো ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ এর ধুঁয়া তুলে।

 ১৫ আগস্ট আর জেলহত্যা দিবসের ১৫ প্রভাব যে কত সুদূর প্রসারী তা আজো বাংলাদেশের মানুষ মর্মে মর্মে টের পাচ্ছে। সচেতন মানুষমাত্রই উপলব্ধি করবেন যে, ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর জেনারেল জিয়ার উত্থান আর বিশ শতকের বাঙালি মীরজাফর খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি বনে গিয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির চেয়ার দখল ছিল সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কেননা ৩ নভেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের অনুরাগী কোটি কোটি মানুষ আবার নতুন আশায় জেগে উঠেছিল। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড মিছিলও বেরিয়েছিল। খন্দকার মোশতাক যাদের নির্দেশনায় পুতুল রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী সেই খুনি মেজররাও আঁতকে উঠেছিল।

 অনেক বিশ্লেষক মনে করেন ৩ নভেম্বর দিনের বেলায় বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান এবং দিন শেষে গভীর রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা একসূত্রে গাঁথা। কারণ, খুনি মেজররা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরাও জানতো কারাগারে বন্দি জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন সুযোগ পেলেই। যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে -- হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যেই তার বিশ্বস্ত সহচর জাতীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করা হয়। খন্দকার মোশতাক গং জাতীয় চার নেতার আনুগত্য এবং সমর্থন চেয়েছিল।

 নীতির প্রশ্নে অটল এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে ক্ষমতা দখলকারীচক্র কিছুতেই টলাতে পারেনি। তারা বঙ্গবন্ধুর খুনি মোশতাকের ক্ষমতাকে বৈধতা দেননি, মেনেও নেননি। সে কারণেই অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর যেভাবে এই চার নেতা তার আদর্শ ও নির্দেশনা শিরোধার্য করে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে কঠোর শ্রম, নিষ্ঠা আর দেশপ্রমে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন, একইভাবে মীরজাফরচক্রও চিরবিদায় নিতে বাধ্য হতো যদি চার নেতা জীবিত থাকতেন। তাহলে বাংলাদেশের সর্বনাশ আরও অনেক কম হতো।

 তারা বেঁচে থাকলে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখল, সংবিধানের পাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ মুছে দিয়ে পাকিস্তানের আদলে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ পরিবর্তন--এর কোনোকিছুই সম্ভব হতো না। যদি ৩ নভেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে খালেদ মোশাররফ জাতির উদ্দেশে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে একটি ভাষণ দিয়ে দেশবাসীকে বিষয়টি অবহিত করতেন, তাহলে ইতিহাস হতো অন্যরকম। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন মীরজাফর মোশতাক সরকারকে উৎখাতের জন্য। কিন্তু কেন যে সেদিন তিনি তা করলেন না, দুভার্গ্য দেশবাসী তা জানার সুযোগ পেল না। জেনারেল খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে তাকে হত্যা করল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সামরিক প্রতিপক্ষ।

-২-

 বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দ্রুত যে পট পরিবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, সে উত্থানকালে মুক্তিবুদ্ধির মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন--বঙ্গবন্ধুর পর তার বিশ্বস্ত সহকর্মী জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্যদিয়ে মূলত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলটিকে (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) নেতৃত্ব শূন্য করে ফেলা হলো। খুনিচক্র এটা বুঝেছিল যে জাতীয় চার নেতার যদি একজনও বেঁচে থাকেন তাহলে যে কোনো ঘটনা তারা ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। যে কারণে কিলিংমিশন শেষ করে জেলগেট থেকে আবার ফিরে গিয়ে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে বেয়নেট চার্জ করে মৃত্যু নিশ্চিত করে এসেছিল। ১৯৭১ সালে এই জাতীয় চার নেতাই নানা প্রতিকূলতা উজিয়ে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে নিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র তিন মাসের মধ্য জাতীয় চারনেতার বিদায় বাংলাদেশের সুস্থ রাজনৈতিক ধারাকে এমন বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে, যার ভোগান্তি আজও ভুগছে বাংলাদেশ। উদার গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ-এ সাম্প্রদায়িকতা, সামরিক শাসন আর হত্যা-ক্যু, পাল্টা ক্যুর মধ্যদিয়ে বিভক্তি মুক্তিযুদ্ধের রক্তফসল এই রাষ্ট্রটিকে একাত্তরের ঘাতকদের চারণভূমিতে পরিণত করে। যে কারণে সৌভাগ্যক্রমে দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যাওয়া জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাকে একুশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে তার আপন পথে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

 ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পাকিস্তানি ভাবধারার বাংলাদেশকে আবার তার মূল পথে ফিরিয়ে আনার মতো দুঃসাধ্য-প্রায় কাজটি প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ম শেখ হাসিনা যখন অনেকটা গুছিয়ে আনতে সক্ষম হলেন, ঠিক তখনই আর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী চক্রটি। দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে এমন এক প্রহসনের নির্বাচন করল ২০০১ সালে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকেই অসার প্রমাণ করে দিল। ২০০১ সালে ষড়যন্ত্রের নির্বাচনে বাংলাদেশ আবার চলে যায় স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে। রাজাকার একাত্তরের-আলবদর-নেতাদের গাড়িতে উঠল জাতীয় পতাকা! একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী মানবতা বিরোধীরাও পবিত্র জাতীয় সংসদ আর মন্ত্রিসভাকে করলো কলঙ্কিত। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সেই দুঃস্বপ্নের মতো পাঁচটি বছর কোনোদিন মুছে ফেলা সম্ভব হবে না।

 মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে তার আপন পথে ফিরিয়ে আনার সুযোগ আবার সৃষ্টি হয় ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে। গত এক দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পথে উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির যে স্বর্ণসোপানে আরোহন করেছে বাংলাদেশ, তা আজ বিশ্ববাসীর কাছেও পরম বিস্ময়। মর্যাদায় মহিমায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বময় উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ম শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের বরেণ্য নেতা। কিন্তু এই গৌরবের বাংলাদেশ যারা চায় না, তাদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। দেশে বিদেশে তারা এখনো সক্রিয়। এখনো তারা আরও একটি একুশে আগস্ট সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই এবারের ৩ নভেম্বর তথা জেলহত্যা দিবসের তাৎপর্য অন্য রকম।

 এবারের জেলহত্যা দিবস আমাদের সতর্ক হবার প্রেরণা যোগাবে। ১৯৭৫ সালে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর বাঁক বদলের মতো সর্বনাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কারাগারের মতো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে যখন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির টেলিফোন-নির্দেশে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের নৃশংসতার মাত্রা কী! খন্দকার মোশতাক আওয়ামী লীগে ছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে, যেমন ছিলেন জিয়াউর রহমান সেক্টর কমান্ডার হয়ে, সময়মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। সংবিধান থেকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ মুছে দিয়েছেন এবং পঁচাত্তরের খুনিদের বিচারের পথ আইন করে বন্ধ করেছিলেন।

 আজ ৩রা নভেম্বর ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায় স্মরণ করার দিন। আজ বাঙালির প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনাশ করতে চায় যারা তাদের নতুন করে প্রজন্মের কাছে চিনিয়ে দেবার দিন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি যারা করতে চান সেই তরুণ প্রজন্মকে জানিয়ে দিতে হবে- আদর্শের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের মূল দর্শনের প্রতি কতখানি অবিচল আস্থা থাকা উচিত। নিজের জীবনও যে আদর্শের কাছে তুচ্ছ তার স্বাক্ষরতো রেখে গেছেন কারাগারে নিহত জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর কাছে আত্মসমর্পন করেননি তারা, আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি খুনিদের মন্ত্রিসভায়। আজকের দিনে রাজনীতিতে সেই নৈতিকতারই অভাব চরম পর্যায়ে। নতুন প্রজন্ম গর্ব করতে পারেন- এমন ত্যাগী নেতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ঘনিষ্ট সহচররা আমাদের ইতিহাসে আছেন, তাদের কথা বারবার নানা আঙ্গিকে নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। তবেই এসব দিবস পালনের সার্থকতা।

#

৩১.১০.২০১৯ পিআইডি ফিচার